দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 01 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৮ ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সংকট ও বিশ্বব্যাঙ্কের সুপারিশ

দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্থসংকট রয়েছে। সরকার শিক্ষখাতে যে টাকা বরাদ্দ করেন, তার একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু আয় আছে তার পরিমাণ কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট অর্থের শতকরা ১৩/১৪ ভাগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। চলতি অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ প্রায় সাড়ে ৪৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার থেকে সাড়ে ৩৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। বেতন বাবদ পাওয়া যাবে ৫ কোটি ৪০ হাজার টাকার কাছাকাছি। ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৭ কোটি টাকা। সরকার ও মঞ্জুরী কমিশনের নিকট এই টাকাটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চেয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ প্রতিবছরই বাড়ছে। সে তুলনায় আয় বাড়ছে না। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ব্যয় বেড়েছে আগের বছরের তুলনায় শতকরা সাড়ে ২১ ভাগের উপর।

জানা গেছে এ রকম পরিস্থিতিতে মঞ্জুরী কমিশনের নিকট শিক্ষামন্ত্রণালয় প্রস্তাব দিয়েছে ছাত্রবেতন তিন গুণ করতে হবে এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি দ্বিগুণ করতে হবে।

এই সুপারিশের আগে সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য ও অনুদানের প্রস্তাব রেখেছিল। অর্থমন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাবটি দেয়া হয়েছিল। বিশ্বব্যাংক আপত্তি জানিয়ে পরামর্শ দিয়েছে অভ্যন্তরীণভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য।

তখন মঞ্জুরী কমিশনের নিকট টিউশন ফি বাড়ানো, হোষ্টেল চার্জ বাড়ানো এমন কি লাইব্রেরী চার্জ বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে শিক্ষমন্ত্রণালয় থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রবেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে বাজার অর্থনীতি। বাংলাদেশে বাজার অর্থনীতি চালু করা হয়েছে বলে সরকার দাবী করেন। মনে হয় এর আগে বাংলাদেশ বাজার অর্থনীতির বাইরে কমান্ড অর্থনীতির শাসনে ছিল। কোন কিছু করতে হলেই বাজার অর্থনীতির দোহাই দেয়া হয়।

একথা মেনে নিতে বাধা নেই যে গত এক দশকের উপর থেকে বাজারের হাল, মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদন মন্দার পরিণামে দেশে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি এখন লাগাম ছাড়া।

এ অবস্থায় শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হয়েছে, শিক্ষা উপকরণ অর্থাৎ বই পুস্তক কাগজ ইত্যাদির দাম বেড়ে গেছে। বেড়েছে আসবাবপত্রের দাম; নির্মাণ ব্যয় ইত্যাদি ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। খাদ্যদ্রব্যের দাম এক দশক আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবেতন, হোষ্টেল চার্জ একই রয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট একদশক আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশি। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দায়দেনা বেড়েছেবলাচলে।

ছাত্রবেতন হোষ্টেল চার্জ সেই আলোকে বাড়ানোর প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে সামনে আসে। এক্ষেত্রে এ যাবৎ সরকার এই বর্ধিত ব্যয় বহন করে আসছে। শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের অর্থ অবশ্য জনগণের পকেট থেকেই আসে। রাজস্ব আয়ের একটা অংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়। প্রতিবছরই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু জাতীয় আয়ের অনুপাতে তা নিম্নমুখী। আর এভাবেই শিক্ষাখাতে রেকর্ড অর্থের সংস্থান করা হয়েছে বলে সরকার গর্ব করে থাকেন।

সরাসরি ছাত্রবেতন এবং হোষ্টেল চার্জ বাড়াতে গেলে ছাত্র সমাজে অসন্তোষ দানা বাঁধার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষাখাতে ক্রমাগত জাতীয় আয়ের অংশ না বাড়িয়ে সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধিক অর্থসংস্থান সম্ভব নয়।

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানো দরকার। আর যুক্তিটা যদি এভাবে আসতো শিক্ষাখাতের ব্যয়ভার আরো কিছুটা অভিভাবকদের বহন করতে হবে। তাহলে ছাত্র বেতন ইত্যাদি বাড়ানোর যুক্তির একটা ভিত্তি আছে মেনে নেওয়া যেত। তারপরও কথা থেকে যায়। সামাজিক সেবার মুখ্য খাত হল শিক্ষা। এক্ষেত্রে সরকারের লাভ-লোকসানের হিসাবটা বাজার অর্থনীতি অনুযায়ী দেখা সমীচীন নয়। সেখানে এখন খোলা বাজারের খোঁড়া অজুহাত দাঁড় করানো সরকারের যুক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায়। বরং সরকার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই টিউশন ফি কিছুটা বাড়ানো দরকার এবং হোষ্টেলের খাবারের মান উন্নত করার জন্য হোষ্টেল চার্জ বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এ যুক্তি নিজে থেকে দিলে শোভন হত।

বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শ নিয়ে যখনই এ ধরনের কাজে হাত দেয়া হয়, তখন প্রথমেই বাধাটা আসে মনের দিক থেকে স্বভাবত। সাধ্য অসাধ্যের প্রশ্নটা আসে পরে। কারণ, নাবালকের অছি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনায় সবক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশ, উপদেশ, পরামর্শ গ্রহণ কোন স্বাধীন জাতির আত্মসম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন না করে পারে না।